



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সম্পর্কের বহুকৌণিকতা: হরিশংকর জলদাসের গল্প

সুভাষ উপাধ্যায়

প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিমূর্ত :

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস সমাজ সংসারের মধ্যে থেকেই সম্পর্কের রাজনীতিগুলিকে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে সম্পর্কের বহুকৌণিকতার প্রসঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের আগমনের কথা উঠে এসেছে বারবার। শুধু তাই নয়, ষড়রিপুর বন্ধন থেকে যে কোনো মানবমন মুক্ত নয়, তারও বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার। এমনকি তাঁর গল্পের কাহিনির পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ। তাই তাঁর গল্পের কাহিনীতে যৌন প্রেষণার প্রসঙ্গ থাকাটা অতি স্বাভাবিক বিষয়। এমনকি তাঁর গল্পের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখতে পাই নারী হৃদয়ের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিকে। জীবন অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব প্রজ্ঞা শক্তির গুণে সমাজের অভ্যন্তরীণ নিষ্পেষিত, পদদলিত, নির্যাতিত ব্রাত্যজনের জীবনকথার পাশাপাশি অবদমিত নারী মনের হৃদয়বৃত্তির জটিল তত্ত্বগুলিকে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

সূচক শব্দ :

বহুমাত্রিক সম্পর্ক, মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ফ্রয়েডের তত্ত্বকথা, যৌন-প্রেষণা, মানবমনের সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়া, দাম্পত্য সম্পর্কে উপেক্ষার উপস্থিতি।

মূল আলোচনা :

বাংলাদেশের আটপৌরে জীবনকথার পাশাপাশি সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা যাঁর লেখনীর কাহিনিবৃত্তে জীবন্ত দৃশ্যের ন্যায় চিত্রিত হয়েছে, তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস। তিনি ১৯৫৫ সালের ১২ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের এক জেলে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^১ হয়তো সেই কারণেই, তাঁর সাহিত্যের নানান অনুষঙ্গে স্থান পেয়েছে কৈবর্ত সমাজ। এমনকি, তিনি সমাজ সংসারকে একেবারে সামনে থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর সাহিত্যে কেবল মুখোরোচক কাহিনি নির্মাণ করেননি, পাশাপাশি রচনা করেছেন বাস্তব সমাজের জীবনচর্যা, বিদ্রোহ, হাহাকার ও প্রাপ্তির ইতিহাস। তাই তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে খুনি, বেশ্যা, কোটনা, পাগলি, মুচি, মেথর, জেলে, চাষী, শিক্ষক, গৃহিণী, দোকানদার, কিংবা সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তিত্বের জীবনকথা। কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস বিচক্ষণতার সঙ্গে মানব মনের কিংবা তাদের প্রাত্যহিক আচার-আচরণের নিটোল বর্ণনা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। শুধু তাই নয়, সম্পর্কের বহুকৌণিকতায় বিধ্বস্ত হয়ে নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ক কীভাবে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চিরশত্রুতে পরিণত হয়ে উঠছে, সেই মর্মস্তুদ সম্পর্ক হননের বিষয়টিও সমান দক্ষতায় তিনি তাঁর রচনায় উপস্থাপন করেছেন।

দুই.

কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের বাবা যুধিষ্ঠির জলদাস পেশায় ছিলেন একজন জেলে। তিনি বংশে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালানোর লক্ষ্যে লেখককে স্কুলে পাঠান। লেখক প্রথম জীবনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করার আশা মনে পোষণ করে নিজেই এগিয়ে নিয়ে যান। কারণ তিনি সব সময় সংসারের অভাব-অনটনকে চিরবিদায় দিতে চাইতেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে দেবেন্দ্রলাল দে'র পাঠশালায়। তারপর তিনি পতেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। ১৯৭১ সালে এস.এস.সি. পাস করেন। এরপর চট্টগ্রাম কলেজ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষার পাঠ গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। আর সেই গবেষণার হাত ধরে তিনি অর্জন করেন পি.এইচ.ডি. উপাধি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে লেখক শিক্ষাজীবন শুরু করলেও, বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান।^২ কথাসাহিত্যিক হিসাবে যদি আমরা তাঁর রচনা সম্ভারের দিকে নজর রাখি তাহলে দেখতে পাই অজস্র সাহিত্য সম্ভার।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হল— জলদাসীর গল্প (২০১১), লুচ্চা (২০১২), হরিকিশোরবাবু (২০১৪), কোনো এক চন্দ্রাবতী (২০১৫), মাকাল লতা (২০১৫), চিত্তরঞ্জন অথবা যযাতির বৃত্তান্ত (২০১৬), কাঙাল (২০১৬), বাছাই বারো প্রভৃতি।^৩

তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হল যথাক্রমে— জলপুত্র (২০০৮), দহনকাল (২০০৯), কসবি (২০১১) রামগোলাম (২০১২), মোহনা (২০১৩), হৃদয়নদী (২০১৩), আমি মৃণালিনী নই (২০২৪), প্রতিদ্বন্দ্বী (২০১৪), এখন তুমি কেমন আছো (২০১৫), সেই আমি নই আমি (২০১৬), একলব্য (২০১৬), অর্ক (২০১৭), রঙ্গশালা (২০১৭), ইরাবতী (২০১৭) প্রভৃতি।^৪

হরিশংকর জলদাস ছিলেন দেশের প্রতিষ্ঠিত নানান পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। এই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখকের গবেষণাধর্মী অজস্র লেখা। সেই লেখাগুলির মধ্যে অন্যতম হল— কবিতা ও ধীবরজীবনের কথা (২০০১), কবি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং (২০০২), লোকবাদক বিনয়বাঁশী (২০০৪), জীবনানন্দ ও তাঁর কাল (২০০৫), কৈবর্তকথা (২০০৯), বাংলা সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ (২০১১), নিজের সঙ্গে দেখা (২০১২), আমার কর্ণফুলী (২০১৬), জলগদ্য (২০১৭) প্রভৃতি।^৫

কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য পেয়েছেন অনেকগুলি পুরস্কার। সেই পুরস্কার গুলি হল— ২০১০ সালে দহনকাল উপন্যাসের জন্য অর্জন করেন 'প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার', ২০১২ সালে রামগোলাম উপন্যাসের জন্য 'সিটি আনন্দ আলো পুরস্কার' এবং 'বাংলাদেশ মানবাধিকার সম্মাননা পদক', ২০১৩ সালে জলপুত্র উপন্যাসটির জন্য 'আলাওল সাহিত্য পুরস্কার', ২০১৪ সালে প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাসের জন্য 'ব্র্যাক ব্যাঙ্ক-সমকাল সাহিত্য পুরস্কার'।^৬

তিন.

'সমাজ' শব্দটি তিনটি শব্দের সমবায়। কিন্তু এই শব্দের ব্যাপ্তি সুদূর প্রসারিত। যেখানে আলোচিত হয় জগত সংসারের সার্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকসমূহ। এই সমাজের একক হিসাবে যদি আমরা মানুষকে ধরি, তাহলে তার অভিকর্ষ-মহাকর্ষ হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা কখনোই ভুলে যেতে পারি না। এই সম্পর্ক বহুমাত্রিক। প্রত্যেকটি সম্পর্কে রয়েছে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত। এই অভিঘাতে বেশিরভাগ সময় অনুরণিত হতে শোনা যায় সম্পর্কের নানান অসঙ্গতির কথা। এই বহুমাত্রিক সম্পর্কের মধ্যে অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্ক। এই সম্পর্ক একটি বিবাহ বন্ধন দ্বারা সৃষ্টি হলেও, তার সুস্থিরতা নির্ভর করে দুটি মানুষের মনের ওপর। কখনো কখনো দেখা যায়, দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ। এই তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ একদিনে বা কোন এক ঘটনার ফল নয়, তা দুটি মনের দীর্ঘদিনের অসামঞ্জস্যতার প্রতিফল।

কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব জুড়ে রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের ছন্দপতনের নানান অনুষঙ্গ। অর্থাৎ, তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশের কথা। তবে শুধুমাত্র দুটি মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে তৃতীয় পক্ষের আহ্বায়ক এমনটা নয়। অনেক সময় দেখা যায় দীর্ঘদিন অদর্শনের ফলে তৃতীয় পক্ষের আগমন ঘটে। ফলস্বরূপ সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরতে থাকে।

তাঁর গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে দাম্পত্য সম্পর্কের যৌন চাহিদার কথা। পাশাপাশি দেখা যায় সেই চাহিদা যথার্থ সময়ে উপশম না হওয়ার কারণে একটি সম্পর্ক কীভাবে অতল সমুদ্রে ভেসে যায় তার শিহরিত চিত্ররূপ। সেই কারণেই আমরা জলদাসীর গল্প গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কোটনা', 'সুবিমলবাবু', 'ডেন্ডেরি'; লুচা গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'লুচা', 'প্রতীক্ষা', 'ভাঙ্গন', 'ভালোবাসার পিঁড়ি'; কোনো এক চন্দ্রাবতী গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'কোনো এক চন্দ্রাবতী', 'কিরকমভাবে বেঁচে আছি' প্রভৃতি গল্পগুলিকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি। মূলত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের নিরিখে সম্পর্কের বহুকৌণিকতার বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করাই আমাদের প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

চার.

হরিশংকর জলদাসের জলদাসীর গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত অন্যতম একটি গল্প 'কোটনা'। এই গল্পে আমরা সম্পর্কের বহুকৌণিকতার বিষয়টিকে দেখতে পাই। গল্পের মধ্যে দেখা যায় ক্ষীরমোহনের মা অঞ্জনার সঙ্গে কাকা গৌরচাঁদের অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা। গল্পকার চতুর্থের সঙ্গে অঞ্জনা চরিত্রের রূপায়ন করেছেন। আমরা যদি গল্পের দিকে নজর রাখি তাহলে দেখতে পাই অঞ্জনার দ্বিচারিতার দিকটি। দাদা শ্যামচাঁদ যখন গৌরচাঁদকে জালে যাওয়ার জন্য বলে তার উত্তরে অঞ্জনা জানায়—

গৌরচাঁদের শরীরটা বলে আইজ় ভালো নাই। গৌরচাঁদ জালে যাবে না।^৭

এই কথার সূত্র ধরে যদি আমরা অঞ্জনা চরিত্রটি বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের কাছে তার মাতৃত্বের দিকটি প্রকাশ পায়। কিন্তু গল্পে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পাই অঞ্জনার মাতৃত্বের আরেক রূপ। এই অঞ্জনাকেই বলতে শোনা যায়—

কি আর কইরবে। গাউর না নিলে ক্ষীরমোহনকে লগে লই যাও।^৮

এখানে অঞ্জনা নিজের সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের কোনো ভাব দেখালো না। সাধারণত আমরা জানি নিজের সন্তানের প্রতি মাতৃত্বের স্ফূরণ সর্বাধিক এবং সর্বপ্রথম দেখা যায়। কিন্তু অঞ্জনার আচরণ তা প্রমাণ করে না। যদি আমরা প্রশ্ন করি, অঞ্জনার এমন দ্বিচারিতার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পারি, অঞ্জনা গৌরচাঁদের প্রতি যে আচরণ করেছে তার পিছনে মাতৃত্বের শক্তির বদলে কাজ করেছে প্রণয়াসক্তি। এখন জানতে ইচ্ছে করে, অঞ্জনা কেন গৌরচাঁদের প্রতি প্রণয়াসক্ত হল? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে হলে গল্পের ভেতর প্রবেশ করতেই হয়। গল্পে দেখা যায় শ্যামচাঁদ সংসারের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে হয়তো শ্যামচাঁদের তেমন উৎসাহ দেখা যেত না। শুধু তাই নয়, কঠোর পরিশ্রমের কারণে শ্যামচাঁদের শারীরিক সৌন্দর্য হারাতে অতি স্বাভাবিক বিষয়। অন্যদিকে গৌরচাঁদ কোনোরকম কঠোর পরিশ্রম না করে দাদার সংসারে বসে বসে দিনপাত করে। স্বভাবতই গৌরচাঁদের শারীরিক সৌন্দর্য ও পুরুষত্ব শ্যামচাঁদকে অতিক্রম করে যায়। এখন যদি আমরা মনস্তত্ত্বের দিকে নজর রাখি তাহলে বুঝতে পারব মানবমনের এক গোপন রহস্যের কথা। মানুষের মন সর্বকালে সুন্দরের উপাসক ছিল, আছে এবং থাকবে। এমনকি নারী মনের আসক্তি মেটানোর জন্য উপযুক্ত পুরুষকেই কামনা করে। সেই কারণে হয়তো অঞ্জনা সংসারের চাপে বৃদ্ধ শ্যামচাঁদের বদলে গৌরচাঁদকে বেশি পছন্দ করত। অন্যদিকে শ্যামচাঁদ সংসারের স্বার্থে তার পেশা নিয়ে ব্যস্ত। কাজের চাপে শ্যামচাঁদ অঞ্জনাকে পরিমিত সময় দিতে পারত না। এদিকে অঞ্জনার যৌবনের ক্ষুধা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ গোপনে অঞ্জনা ও শ্যামচাঁদের দাম্পত্য জীবনে দূরত্বের রশ্মি ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। তাই বাড়িতে থাকার কারণে অঞ্জনার যৌবনসঙ্গীতে পরিণত হয় গৌরচাঁদ। কারণ শ্যামচাঁদ অপেক্ষা গৌরচাঁদের কাছে রূপ ও সময় দুটোই ছিল।

অর্থাৎ, ক্ষীরমোহনের বাবা শ্যামচাঁদ, মা অঞ্জনা ও কাকা গৌরচাঁদের মধ্যকার ত্রিকোণ সম্পর্কের ভেতরে যে মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক কারণ কাজ করেছে সেগুলি হল— প্রথমত, সুন্দর সুঠাম পুরুষ দেহের প্রতি নারী মনের অদম্য বাসনা এবং দ্বিতীয়ত, শ্যামচাঁদ ও অঞ্জনার মধ্যকার দূরত্ব।

অঞ্জনা ও গৌরচাঁদের সম্পর্কের মূলে রয়েছে ফ্রয়েডের তত্ত্বকথা। তা হল—

...অদসে কাল বা time -এর কোন ধারণা নেই। ... এককথায় বলতে গেলে অদস্ হল আমাদের মনের প্রবৃত্তিতাড়িত অংশ যেখানে পরস্পরবিরোধী কামন-বাসনা যেন

অনন্তকাল ধরে বিচারবোধহীনভাবে কেবল তৃপ্তি সাধনের লক্ষ্যে সেইদিকে ধাবিত হবার সুযোগ খুঁজছে।^৯

তাই আদিম প্রবৃত্তির বশে অঞ্জনা ও গৌরচাঁদ ফাঁকা ঘর পেয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। তারা ভুলে গিয়েছে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। গৌরচাঁদের বদলে ক্ষীরমোহনকে জালে নিয়ে গেলে বাড়ি সম্পূর্ণ ফাঁকা থাকবে এবং নমিতা ও গৌরচাঁদ নিরিবিলিতে যৌনক্রীড়ায় লিপ্ত হতে পারবে। এখানে অঞ্জনা বিচারবোধহীনভাবে কামনা-বসনা তৃপ্তির জন্য কেবল সুযোগ খুঁজছে।

‘লুচা’ গল্পের কাহিনিতে গল্পকার হরিশংকর জলদাস নির্মাণ করেছেন সুধাম-সুচিত্রা-স্বপনের মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক। গল্পে দেখা যায় সুধাম পরিবারের সুখের জন্য নিজের কাঁধে তুলে নেয় সংসারের ভার। এমনকি তার নিজের দেখা স্বপ্নগুলি ভাই স্বপনের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করার ইচ্ছায় তাকে পড়াশোনার কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা করে। সুধামের বিয়ের বয়স হলে সুধারানী বিয়ে দেয় সুধামের। কিন্তু সংসারকে আরো সুখের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সুধাম বিয়ের চার মাসের মধ্যে পাড়ি দেয় কুয়েত। সুধাম কুয়েত গিয়ে অনেক টাকা পাঠায়। সেই টাকায় সুচিত্রাকে গয়না কিনে দিলেও তার মনে আনন্দের কোনো শিহরণ জাগলো না। কারণ তার মনে রাজত্ব করে আছে একাকীত্ব। সেই একাকীত্বের সিংহভাগ জুড়ে বাসা বেঁধে রয়েছে যৌন-প্রেষণ। সুচিত্রার মানসিক অবস্থার চিত্র আঁকতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন—

... তার চলাফেরায় নিম্পৃহ ভাব। রাতে তার দেহ জাগে। অদম্য শিহরণ তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বিয়ের প্রথম প্রথম বড় ভয় লাগত, পরে মধুর আবেশে ভরে গিয়েছিল তার মন আর দেহ। একশ'র অধিক রাতের বিভোরতা সুচিত্রাকে আকুল করে তোলে। বালিশ খামচে ধরে সে রাত ফুরায়।^{১০}

মানবমনের বাইরে থেকে আমরা বলতে পারি, সুচিত্রার এরূপ আচরণের কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে দেখতে পাই দাম্পত্য জীবনে যৌন তাড়নার বিষয়টিকে। সদ্য বিবাহিত দাম্পত্য সম্পর্কে থাকে যৌনমিলনের তীব্র উন্মাদনা। এই উন্মাদনায় জেগে ওঠা রতি ভাব বাহ্যিক অর্থ ও বস্তুর দ্বারা অবদমিত হয় না। তাই হয়তো সুধামের পাঠানো টাকায় কিনে দেওয়া গয়না সুচিত্রার মনে ও প্রাণে সুখের আবেশ আনতে ব্যর্থ হয়। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাত ধরে আমরা এও জানি যে, নারী মনের যৌনমিলনের স্পৃহা পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে বেশি। তাই সদ্য বিবাহিত সুচিত্রার যৌন তৃষ্ণা মেটানোর জন্য যাকে প্রয়োজন সে হলো তার স্বামী। সুধাম যেহেতু চার মাস বিয়ের পরেই অধিক অর্থ সঞ্চয়ের আশায় কুয়েত পাড়ি দেয়। তখন থেকেই সুচিত্রার মনের ভিতর যৌনতার শর প্রতিনিয়ত বিদ্রোহ করত। সুচিত্রার মনের একাকীত্বের কারণ সুধারানী জানত। তাই সে স্বপনকে সুচিত্রাকে সঙ্গ দিতে বলে। কিন্তু এর প্রতিফল বড় ভয়ানক হয়ে ওঠে। সুচিত্রা ও স্বপনের মধ্যে গড়ে ওঠে অবৈধ সম্পর্ক। দু'বছর পর সুধাম অনেক টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলেও সুচিত্রার মন কিন্তু সুধামে আর নেই। সুচিত্রা যেন প্রাণ সাঁপেছে স্বপনের উদ্দেশ্যে। সুচিত্রা সুধামের সঙ্গে থেকেও যেন আনমনা। এ প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন—

রাতে সুধাম সুচিত্রায় নৌকা ভাসায়। সুচিত্রা তরঙ্গিত হয়, সুধাম শক্ত হাতে হাল ধরে। জল কেটে সুধামের নৌকা গন্তব্যে পৌঁছে। একরাতে সুধামের হঠাৎ মনে হল - সুচিত্রা যেন সুচিত্রাতে নেই।^{১১}

এখন যদি আমরা প্রশ্ন করি, স্বামীর বিদেশ পাড়ি দেওয়ার জন্য সুচিত্রার মনকে একাকীত্ব গ্রাস করেছিল, এখন স্বামী কাছে থাকলেও তার মন তখনকার মতো মনমরা কেন? কারণ সুধামের অবর্তমানে স্বপন সুচিত্রার যৌনক্ষুধার প্রাত্যহিক সঙ্গীতে পরিণত হয়। তাই সুধাম অপেক্ষা স্বপনের প্রতি সুচিত্রার যৌনক্রীড়ায় বেশি টান।

গল্পের কাহিনির শেষের দিকে দেখা যায় সুধাম কাকার কথার সূত্র ধরে জানতে পারে সুচিত্রা ও স্বপনের মধ্যকার সম্পর্কের কথা। তখন সুধাম সুচিত্রার মনের দোলাচলতার প্রকৃত কারণটি উপলব্ধি করতে পারল। শুধু তাই নয়, স্বপনের বিয়ের কথা উঠলে সুচিত্রার সুধারানীর প্রতি বিরূপ আচরণ এবং স্বপনের অমতের কারণও এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে সুধাম পাগল হয়ে যায়। এবং তাকে বলতে শোনা যায়—

ও কাকা, ও কমিশনারসাব, ও মাসিমা, ও মৃণাল, আমার বউয়েরে কুণ্ডায় ছুঁয়েছে। লুচাই লুইট্যা লইছে আমার বউয়ের যৌবন, সতীত্ব গেছে তার। আমি বলে পাগলা! হা হা হা হা....।^{১২}

অর্থাৎ, সুধাম-সুচিত্রা-স্বপনের মধ্যকার এই ত্রিকোণ সম্পর্কের প্রধান কারণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দূরত্ব। এই দূরত্বের কারণে মন যৌনতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য একটা অবলম্বন খোঁজে। স্বপন সুচিত্রার কাছে সেইরকম এক অবলম্বন। যে তার নারীত্বের জ্বালা উপশম করে সারা শরীরে আনন্দের শিহরণ জাগাতে সমর্থ হয়েছিল।

‘প্রতীক্ষা’ গল্পের মধ্য দিয়ে গল্পকার এক নতুন দাম্পত্য সম্পর্কের কাহিনি পরিবেশন করেছেন। এই গল্পে দেখা যায় সুদর্শন ও নমিতার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়ন। সুদর্শন প্রকৃতপক্ষে ছিল নপুংসক। সেই কারণে বাসর রাতে মিলনে নমিতার অসুবিধা থাকলেও সুদর্শনের কাছে তা বিরক্তিকর বিষয় হয়ে ওঠেনি। নমিতার দেহ-মনে যখন মিলনের তীব্র ইচ্ছা জন্ম নেয় তখন সুদর্শন অসুস্থ হয়ে পড়ে। এইভাবে নমিতা ও সুদর্শনের প্রারম্ভিক দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়।

গল্পের কাহিনির অন্তরে যত প্রবেশ করবো তত দেখতে পাবো সুদর্শনের পুরুষত্বহীনতার প্রতিচ্ছবি। সুদর্শনের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের মধ্যে রতিক্রীড়া যে প্রবল উচ্ছ্বাস রয়েছে, তা সদ্যবিবাহিত সুদর্শনের মধ্যে নেই। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর গল্পকার নমিতার যৌন চাহিদার মধ্য দিয়েই উপস্থাপন করেছেন। পাশের ঘরে শ্বশুর-শাশুড়ির রতিক্রিয়ার চরম উচ্ছ্বাসের কোলাহল নমিতার মনকে আন্দোলিত করে তোলে। স্বাভাবিকভাবেই সদ্য বিবাহিত নমিতার মনে কামনার উদ্বেক হয়। তার শরীরে আর মনে উত্তেজনা জাগে। সেই উত্তেজনার বশে সুদর্শনকে সে কাছে পেতে চায়। অর্থাৎ, বিয়ের পর আজ তাদের মিলনের চূড়ান্ত মুহূর্ত তৈরি হয়েছে। নমিতা সুদর্শনের ওপর কামনার আবেশে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখনও সুদর্শনের রতিক্রীড়ায় অনিচ্ছা। এখানেই নমিতা বুঝতে পারে সুদর্শনের শিল্প নিষ্ক্রিয়। তখন সুদর্শন অকপট স্বীকারোক্তিতে নমিতাকে জানায়—

নমিতা আমাকে মাফ কর। আমি বড় অন্যায্য করে ফেলেছি। তোমাকে বিয়ে করে তোমার জীবনটা আমি তছনছ করে দিয়েছি। আমি অক্ষম। নারী সন্তোগ করার মতো কোনরকম সক্ষমতা আমার মধ্যে নেই।^{১৭}

গল্পকার হরিশংকর জলদাস দেখাতে চেয়েছেন নপুংসক স্বামীর কাছে একজন পূর্ণ যৌবনা রমণীর বিলাপের কথা। তাই নমিতার মনে জেগে ওঠা মনস্তত্ত্বের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন—

শরীরে বিশেষ স্থানে থই থই জল। কি করবে সে এই জল নিয়ে, এই স্তন নিয়ে, এই ঠোঁট নিয়ে, এই গ্রীবা নিয়ে, এই কপোল নিয়ে, এই কামময় উষ্ণ নিঃশ্বাস নিয়ে? কাকে নিয়ে ভাববে সে? একার কোনো রাত থাকল না, যেহেতু স্বামী-স্ত্রীতে নিবিড়ভাবে মাখামাখি হয়।^{১৮}

পূর্ণ যৌবনবতী রমণী যখন জানতে পারে তার স্বামী মিলনে অক্ষম, তখন মিলনে সক্ষম যেকোনো পুরুষই তার কামনার ব্যক্তি হতে পারে। সেই পুরুষ যেন তার যৌবনের ক্ষুধা মেটাতে পারে। এই সম্পর্ক তখন মানে না কোনো বয়স এবং মানবীয় সামাজিক সম্পর্কের বাঁধন। তাই কামনার তীব্র বাসনার ঘোরে নমিতার আচরণ এটাই বলে যায়—

হঠাৎ করে বিছানায় উঠে বসল নমিতা। দরজার দিকে হন হন করে এগিয়ে গেল। এক বাটকায় দরজাটা হাট করে খুলে দিল। তারপর ধীর পায়ে খাটের পাশে এল। শাড়ি-ব্লাউজ আলগা করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে বিছানায়। এখন তার একজন পুরুষ চাই। যে কোনও চেহারার, যে কোনো বয়সের। হোন না তিনি শ্বশুরের মতো।^{১৯}

অর্থাৎ আলোচ্য গল্পে দেখতে পাই দাম্পত্য জীবন চার দেওয়াল ও ব্যবহারিক সম্পদে পরিপূর্ণ একটি ঘর যথেষ্ট নয়। সেই সম্পর্কটিকে থাকার পিছনে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল পারস্পারিক সঙ্গমের সক্ষমতা। যদি কোন এক ব্যক্তি যৌন মিলনে অক্ষম হন, তাহলে সেই সম্পর্কের মাঝে ফাটল ধরে। এমনকি সেই ফাটলের হাত ধরে সম্পর্কের মাঝে উপস্থিত হয় তৃতীয় পক্ষ।

স্বামী সুদর্শনের পুরুষত্বহীনতার কথা জানার পর নমিতার আচরণ হতাশ মনের কামনা-বাসনার কথাকে অনুসরণ করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, নমিতার আক্ষেপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় প্রাণীজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের তত্ত্ব মেনে বলতে পারি—

অদসের শক্তি আসলে প্রণীজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। এই উদ্দেশ্যটি হল প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তির তৃপ্তি।^{১৬}

তাই নমিতাও সহজাত প্রবৃত্তির হাত ধরে কামোচ্ছা মেটানোর জন্য তার স্বশুরকেও আমন্ত্রণ জানাতেও কুণ্ঠিত নয়। কারণ অদস্ মন সামাজিক রীতি ও সংস্কারকে আঙুল দেখিয়ে তার সহজাত চাহিদাগুলিকে পরিতৃপ্তি দিতে চায়।

‘ভাঙন’ গল্পে কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস দেখাতে চেয়েছেন দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় পক্ষ আগমনের আরেকটি নতুন দিক। গল্পে দেখা যায় কুলদীপ অরুন্ধতীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বে কুলদীপ ও অরুন্ধতী ভেসে যায় সুখ সমুদ্রে। কিন্তু সম্পর্কের প্রায় পাঁচ বছর পরিয়ে যাওয়ার পরও তাদের কোল জুড়ে কোনো সন্তান আসেনি। এই অপ্ৰাপ্তি তাদের সম্পর্কে একটু একটু করে ফাটল ধরাতে থাকে। এই সম্পর্কের ফাটল সেদিনই পূর্ণতা পায়, যেদিন কালী পূজার রাতে অরুন্ধতী প্রদীপ ধরাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তার হারিয়ে ফেলে মুখের সৌন্দর্য। এরপর থেকেই শুরু হয় কুলদীপ ও অরুন্ধতী সম্পর্কের মধ্যকার ট্রাজেডি। যে কুলদীপ অরুন্ধতীতে সারাক্ষণ মগ্ন ছিল, সেই কুলদীপ হতশ্রী অরুন্ধতীকে উপেক্ষা করে সেবাদাসী শকুন্তলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। কুলদীপের এমন আচরণের কথা লিখতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন—

তিনি সৌন্দর্যের পূজারি। অরুন্ধতীর দেহ, যৌবন - সব আছে, কিন্তু অরুন্ধতীতে সৌন্দর্য নেই। কুলদীপ মনে করেন - অগ্নিদেব তার সৌন্দর্যের প্রায় সবটাই কেড়ে নিয়েছেন। অগ্নি-প্রজ্বলিত অরুন্ধতী, মুখমণ্ডলীয় শ্রীহীন অরুন্ধতী এখন কুলদীপ চৌধুরীর কাছে অপ্ৰয়োজনীয়। এখন তিনি অরুন্ধতীকে অবহেলা দেখান না, কিন্তু এড়িয়ে চলেন। তিনি এখন জমিদারিতে মগ্ন, তিনি এখন শকুন্তলাতে নিমগ্ন। শকুন্তলা অরুন্ধতীর সেবাদাসী। শকুন্তলা এখন কুলদীপের সেবা করে। কুলদীপের নদী, জোছনা, কাশবন, সন্দের ঘোর - সবই এখন শকুন্তলাতে আবদ্ধ।^{১৭}

অরুন্ধতীর প্রতি কুলদীপের উদাসীনতা সত্যি কি অবান্তর? নাকি এটি মানবমনের এক নিগূঢ় রহস্য? যদি আমরা মনস্তত্ত্বের অন্দরে প্রবেশ করি তাহলে এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাবো। আমরা প্রত্যেকেই সুন্দরের পূজারি। তাই আমরা জীবনভর সুন্দরের অন্বেষণ এবং আরাধনা করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনেককে বলতে শোনা যায় আমরা রূপের থেকে গুণকে অর্থাৎ মনকে বেশি ভালোবাসি। কিন্তু এই মন্তব্যকে যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় সেখানেও দেখতে পাই সৌন্দর্যের একছত্র রাজত্ব। প্রকৃতপক্ষে সেখানে মনের সৌন্দর্যায়নের উপর মনকে নিবিষ্ট করা হয়। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে, আমরা যতই মনের দিকে মনকে ধাবিত করিনা কেন, যৌন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তির জন্য রূপকেই গুরুত্ব দিই। প্রত্যেক মানবমন অকপটে মেনে নেয় যে, সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত যৌন প্রেমাচার নিয়ন্ত্রক হিসেবে সৌন্দর্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই হয়তো যে রূপের হাত ধরে কুলদীপ ও অরুন্ধতীর দাম্পত্য সম্পর্ক পূর্ণতা পেয়েছিল, আজ সেই সৌন্দর্য না থাকার কারণে কুলদীপ সেবাদাসী শকুন্তলাতে নিমগ্ন হয়েছে। এটাই বাস্তব যে যৌনতার পথে কোন মানুষই নীতির কথা শোনে না। মনকে ভাসিয়ে দেয় রূপ সমুদ্রে। মানবমনের সহজাত প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় সাড়া দিয়ে কুলদীপের এমন আচরণ অতি স্বাভাবিক বিষয়।

অপরদিকে স্বামী উপেক্ষিতা অরুন্ধতী স্বামীর দেখানো পথেই নিজেকে দীক্ষিত করে। কুলদীপ যখন সম্পূর্ণভাবে অরুন্ধতীর রূপ সৌন্দর্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ঠিক তখনই একাকীত্ব, অসহায়তা ও স্বামী উপেক্ষার মর্মজ্বালা অরুন্ধতীকে বিদ্ধ করে। কুলদীপ যেমন সেবাদাসী শকুন্তলাকে নিজের কামনার মানুষ হিসেবে বেছে নিয়েছে, ঠিক একইভাবে একাকীত্বের জ্বালা ও নিজের পূর্ণ যৌবনের তড়না অবদমনের লক্ষ্যে অরুন্ধতীও বেছে নিয়েছে রামলালকে। শুধু তাই নয় যৌবনের জ্বালা নারীকে কতটা উন্মাদিনী করে তোলে তা অরুন্ধতীর উপলব্ধিতেই স্পষ্ট—

কি দেখছ তুমি রামলাল? তোমার চোখের রঙ্গ আমাকে বলে দিচ্ছে, তুমি আমাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবছ। তুমি এই মুহূর্তে মাথা নত করে থাকলেও তোমার ভেতরটা ভাঙছে আমি দেখতে পাচ্ছি। সে ভাঙা কামের, তোমার মুখ, কপাল আর গালের বিন্দু বিন্দু ঘাম প্রমাণ দিচ্ছে। আমার ভেতরটাও কিন্তু এখন এই মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

কাউকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আমার। আমার ভেতরের প্রজ্জ্বলিত আগুন নেবাবার জন্য একটা জলধারা দরকার। রামলাল, আমি দীর্ঘদিনের বুভুক্ষু একজন নারী। তুমি আমাকে শীতল সরোবরে অবগাহন করাও রামলাল।^{১৮}

আমাদের সমাজে আমরা এ বিষয়ে খুব সচেতন যে, কোন নারী তার জীবনের পার্থিব সকল বস্তুর ভাগ বাঁটোয়ারা করে থাকলেও, সে তার স্বামীর ভাগ কোনো নারীর সঙ্গে করতে রাজি নয়। যখন কোন নারীর স্বামী তার চোখের সামনেই অন্য নারীর সঙ্গে কামকরীড়ায় লিপ্ত, তখনই তার মনে জ্বলে ওঠে প্রতিহিংসার দাবানল। সেই সময় সেই নারীর মনের অবস্থা কিছুটা অনুমান করে বলতে হয় যে, সে ওই পরনারীকে হত্যা করবে, না হয় নিজে অন্য পরপুরুষের কামনার বস্তুতে পরিণত হবে। কারণ মনস্তত্ত্বের আন্দরে প্রবেশ করলে এটাও বোঝা যায় যে, একজন নারী তার স্বামীকে অন্য নারীর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত দেখলে, তখন স্বাভাবিকভাবে তার মনে সঙ্গম স্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু কোন ভাবে স্বামীকে সে তার রূপ-যৌবনের ছটায় আসক্ত করতে না পারলে সে হিংসার বারুদ স্তুপে পরিণত হয়। এমন পরিস্থিতিতে ওই নারীর সঙ্গমের বাসনা এতটাই তীব্র হয়ে উঠে যে, তখন সে নিজেকে যে কারো কাছে মেলে ধরতে বাধ্য হয়। শুধুমাত্র যৌনতার ক্ষিদেকে অবদমিত করার জন্য। নারীর এই অদম্য সন্তোষাত্মক বাসনার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে গল্পকার লিখেছেন—

তেল কুচকুচে রামলালের শরীরে যৌবনের গন্ধ। সেই গন্ধে মাতোয়ারা বহুদিনের ক্ষুধার্ত অরুন্ধতী। নিস্তরঙ্গ নদীর বুকে খরস্রোতা জল, সেই জলের উপর মৃদু কম্পমান বজরা। বজরার ভেতরে, শয্যাঘরে থই থই জল।^{১৯}

কুলদীপ অরুন্ধতীর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাকে বিয়ে করে। যখন প্রদীপের আগুনে অরুন্ধতীর মুখের সৌন্দর্য হারিয়ে যায়, তখন কুলদীপ সেবাদাসী শকুন্তলাতে নিমগ্ন হয়। কুলদীপের সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আসক্তির কারণ কী? তা জানতে হলে ফ্রয়েডের তত্ত্বের সূত্র ধরে বলতে হয়—

অদস্ হচ্ছে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির आधार। ...অদস্ চালিত হয় সুখ-সূত্র বা pleasure - principle- দ্বারা। অর্থাৎ প্রবৃত্তিগুলির একমাত্র লক্ষ্য হল তাৎক্ষণিক বিচার-বিবেচনা বিহীন তৃপ্তিসাধন।^{২০}

অর্থাৎ বলতে পারি কুলদীপ সহজাত প্রবৃত্তির বশে সৌন্দর্যের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রাখতে চায়। কারণ মন সর্বদা সুখের উদ্দেশ্যেই ধাবিত হয়। এই সুখ লাভের ক্ষেত্রে মন কোনরূপ আদর্শের কথা ভাবে না। তখন তার কাছে বিচার-বিবেচনা হীন তৃপ্তিসাধনই একমাত্র কাম্য হয়ে ওঠে। তাই হয়তো কুলদীপ অরুন্ধতীর প্রতি উদাসীন হয়ে আপাত সুন্দরী শকুন্তলার যৌবন সমুদ্রের নিজেকে নিমজ্জিত করেছে।

আবার যদি রামলালের কথা একটু ভাবি, তাহলে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আরেকটি দিক আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। অরুন্ধতীর ডাকে প্রথমে রামলাল সাড়া দিতে দ্বিধান্বিত ছিল। কারণ তার বিবেকবোধ তাকে এই কাজে বাধা দেয়। অন্যদিকে দীর্ঘদিন স্ত্রী মারা যাওয়ায় অবদমিত কামোচ্ছাও তার মনকে নাড়া দেয়। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ভাবনার সঙ্গে একমত হয়ে বলতে হয়—

... অবচেতন মনেই অবদমিত ইচ্ছেদের বাস। অবদমন হচ্ছে অহম-রক্ষণ-কৃৎকৌশলের (Ego-defence mechanism) একটি প্রধান হাতিয়ার। অবচেতন মনের মধ্যেই আছে প্রথম সৃষ্ট বাস্তব মনের কিছু অংশ এবং বিবেকমনের বেশিরভাগ অংশ। ফলে অবচেতন মনের গভীরে যে বিবেকবোধ ও বাস্তববোধ সম্পৃক্ত চেতনা রয়েছে, সেই চেতনাই অবচেতনের মধ্যে সুখমুখী অন্ধ যৌনমানস সব ইচ্ছেকে চরিতার্থ হতে বাধা দেয় - এই বাধাপ্রাপ্ত অবদমিত ইচ্ছেরা কিন্তু বসে থাকার পাত্র নয়। তারা নানা ছলে, নানা আবারণে আভরণে সেজেগুজে ডাকাডাকি করে বেরিয়ে আসতে চায় মনের প্রহরী (censor) বা অবচেতনের বাস্তব ও বিবেকমনের পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে।^{২১}

অর্থাৎ রামলালের মনে জেগে ওঠা বিবেকবোধ দীর্ঘদিনের অবদমিত কামোচ্ছার কাছে পরাজিত হয়। যার ফলস্বরূপ রামলাল চরিত্রের সাধুত্বকে বিসর্জন দিয়ে অরুন্ধতীর যৌবন সমুদ্রে ডুব দিতে পেরেছে।

‘কীরকমভাবে বেঁচে আছি’ গল্পে কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস দাম্পত্য সম্পর্ক কিভাবে নষ্ট হয়েছে তার আরেক চিত্ররূপ তুলে ধরলেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সন্দেহ মনোভাব কিভাবে দাম্পত্য সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে সে বিষয়টি এই গল্পে বাস্তব দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকথকের স্ত্রীর সন্দেহ কিভাবে তাদের সম্পর্ককে দুর্বিসহ করে তুলেছে, তা প্রমাণ করে ছেলেকে লেখা গল্পকথকের একটি চিঠি—

অফিসের বড় কর্মকর্তা আমি। সকাল থেকে বিকেল, কখনো কখনো সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিসে সময় দিতে হয় আমাকে। অফিসে সুন্দরী অসুন্দরী নারীরাও নানা পদে চাকরি করে। একটা অফিস তো শুধু পুরুষ দিয়ে চলে না! ওই নারীরাই আমার দাম্পত্য জীবনের বিঘ্নের কারণ হল।... অফিসের নারী পুরুষ সবাই আমাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আমি কিন্তু তোমার মাকে বিষয়টি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি। কেউ যদি আগে থেকেই কোনো একটা বিষয়কে তার বিশ্বাসের মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে নেয়, তাহলে তার কাছে সব যুক্তি বা প্রমাণ অগ্রাহ্য হয়।

তোমার মায়ের মনের এই বিশ্বাসটা প্রোথিত হয়ে গেল যে, আমি আগে চরিত্রবান থাকলেও, এখন একেবারে পচে গেছি। অফিসের নারীদের নিয়ে আমি কৃষ্ণলীলা মগ্ন। অফিস থেকে দেরি করে আসি শুধু ওদের নিয়ে বেলল্লাপনায় মগ্ন থাকি বলে। আমি কোনোক্রমেই তাকে বোঝাতে পারিনি - আমি যে অফিসে চাকরি করি, তা বিশাল এক শপিং কর্পোরেশনের অফিস। আমি সেই অফিসের অধিকর্তা। এই ধরনের অফিসের কোন টাইমটেবিল নেই। কাজ শেষ না করে বড়কর্তার অফিস ছাড়তে নেই।^{২২}

গল্পের কাহিনিতে দেখতে পাই গল্পকথক স্ত্রীর সন্দেহে কোনরকম প্রতিবাদ না করে সংসারের সুখ শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে চেষ্টা করলে, সেখানে সন্দেহের দানা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মানুষের মন এটাই অনুধাবন করে যে, নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। আবার এই সন্দেহ সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করলে সেখানেও সন্দেহ। তাই বলতে পারি, সন্দেহের ঘুণাপোকা যে সম্পর্কের অন্তরে প্রবেশ করেছে সেই সম্পর্ক অবশ্যই নষ্ট সম্পর্কে পরিণত হবেই। এই গল্পে গল্পকথক ও তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও ত্রিকোন সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। সন্দেহ এখানে তৃতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা কম শক্তিশালী নয়। তৃতীয় পক্ষকে বিভিন্নভাবে সম্পর্কের মধ্য থেকে অপসারণ করা গেলেও সন্দেহকে অপসারণ করা সত্যিই খুব সমস্যার বিষয়। আমরা এটা বিশ্বাস করি যে যদি মানবমন কোন কিছুর প্রতি সন্দেহ প্রবণ হয়, তাহলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার উপর পুনরায় বিশ্বাস আরোপ করলেও, সন্দেহের ঘুণাপোকাকে সমূলে বিনাশ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মনে তা ঈদু, ইগো, সুপার ইগোর দ্বন্দ্ব লিপ্ত হয়ে সম্পর্ককে ক্ষতবিক্ষত করে।

‘কোনো এক চন্দ্রাবতী’ গল্পে গল্পকার চন্দ্রাবতী নামে এক রমণীর বহুগামিতার চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে প্রফুল্ল তার চিঠিতে চন্দ্রাবতীর জীবন ও যৌবন সম্পর্কে যে জবানবন্দি দিয়েছে, তা থেকে আমরা চন্দ্রাবতী চরিত্রটিকে অনুধাবন করতেই পারি। চন্দ্রাবতী যেদিন যৌবনবতী হয়ে উঠে সেই সময় থেকে তার জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের দিনেও দেখা যায় বহুগামিতা বহু দিক। চন্দ্রাবতী বিভিন্ন যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হলেও তার প্রথম প্রেম প্রফুল্লকে সে ভুলে যেতে পারেনি। কিন্তু চন্দ্রাবতী তার প্রারম্ভিক যৌবনের সাথে প্রফুল্লকে সাফল্যের চূড়ান্ত দিনেও কাছে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রফুল্ল পূর্বের মতো ছিল না। সে তার আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন। তখন প্রফুল্ল চন্দ্রাবতীর সেই যৌবন তাড়নাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন চন্দ্রাবতী কান্নায় ভেঙে পড়ে। সেই কান্নার মানে খুঁজতে গিয়ে প্রফুল্ল লিখেছে—

ঠিক ওই সময় অদ্ভুত কাণ্ডটা করলে তুমি। হঠাৎ বাঁপিঁয়ে পড়লে আমার ওপর। ছিঁড়েখুঁড়ে তছনছ করতে চাইলে আমাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বহু দিনের লোভী প্রফুল্ল জাগল না সেদিন। তোমার নাসিকার উষ্ণ বায়ুকে উপেক্ষা করে, তোমার লালায়ুক্ত ঠোঁটকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। বলেছিলাম - চন্দ্রা, প্রফুল্ল মরে গেছে। এখন তুমি যে প্রফুল্লকে দেখছ, সে বহু বছর আগের প্রফুল্ল নয়। তুমি হঠাৎ ডুকরে উঠেছিলে। কেন কেঁদেছিলে তুমি সেই সকালে? প্রথম যৌবনে আমার ওপর যে অবিচার করেছ সেই জন্যে, না খ্যাতিমান তুমি অখ্যাত একজন প্রফুল্লের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল বলে?^{২৩}

ক্ষমতার রাজনীতির দিকে নজর রেখে প্রফুল্লের প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করি, তাহলে দেখতে পাবো চন্দ্রাবতীর কান্নার কারণ হিসেবে প্রফুল্লের দ্বিতীয় অনুমান হয়তো সঠিক। কারণ পুরুষ অপেক্ষা নারী কর্তৃত্বের শিখরে থাকলে পুরুষকে অনেকটা হেয় মনে করে। যে কারণে নারী মনে অহং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তাই গল্পে দেখা যায় প্রফুল্ল চন্দ্রাবতীর থেকে সামাজিক সম্মানে অনেকটা নিচে অবস্থান করে। আর সেই প্রফুল্লের অবজ্ঞা তাঁর কাছে অসম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে ক্ষমতার বৈষম্যের কারণে সম্পর্কের মধ্যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়।

‘সুবিমলবাবু’ ছোটোগল্পে সুবিমলবাবু কৌলিন্য প্রথার মান রাখতে গিয়ে বিবাহের বয়স অতিক্রম করে ফেলেছেন। বর্তমানে তিনি অধ্যাপক। কিন্তু নিজেকে ষড়রিপু বন্ধন থেকে ছিন্ন করতে পারেননি। তাই নিজের বাড়িতে কাজের মেয়ে সুজলার যৌবনের ছটায় বিমোহিত হয়ে পড়েন। সুজলার রূপের ছটা সুবিমলবাবুর মনে কামের উদ্বেক জাগায়। সেই যৌন তাড়না থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে তিনি বাড়ি থেকে তার কর্মস্থানে চলে আসেন। কিন্তু সেই যৌনতার আসক্তি তাঁকে এতটাই গ্রাস করে ফেলেছে যে, তিনি কর্মস্থলের বাসা বাড়িতে এসেও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা থেকে উদ্ধারের জন্য এক সেবাদাসীকে নিযুক্ত করা হয়। যার নাম মালতি। একইভাবে তিনি মালতিরও রূপের ছটায় বিমোহিত হয়ে পড়েন। তারপর বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সুবিমলবাবু জোরপূর্বক রতিক্রিয়ায় মিলিত হন মালতির সঙ্গে। এখানে আমরা দেখতে পাই ঈদু, ইগো এবং সুপার ইগোকে অতিক্রম করেছে বলেই সুবিমলবাবু জাত্যাভিমানের খোলস ত্যাগ করে মালতির সঙ্গে সঙ্গমে যুক্ত হতে পেরেছে।

সুবিমলবাবু সামাজিক রক্ষনশীলতার বেড়াজালে নিজের যৌন চাহিদাগুলিকে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুজলার যৌবনের ছটা সুবিমলবাবুর মনে যে স্বপ্নের পরিসর নির্মাণ করে তার সার্থক প্রকাশ ঘটে মালতির সঙ্গে সঙ্গমে। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে বলা যায়—

স্বপ্ন তৈরির (dream formation) কাজ দুটি ভিন্ন পন্থার দ্বারা প্ররোচিত হয়। হয় কোন ভিন্ন প্ররোচিত প্রবৃত্তিগত অবদমিত আবেগ (instinctual repressed impulse) (অর্থাৎ নির্জ্ঞান ইচ্ছা) এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে নিদ্রাবস্থায় অহমের ওপর প্রভাব বিস্তারে চেষ্টা করে, অথবা আমাদের জাগ্রত অবস্থায় কোনো কামনা, কোনো অবচেতন চিন্তার শৃঙ্খল তার সমস্ত আনুষঙ্গিক বিরোধী আবেগসহ, নিদ্রাবস্থায় কোনো নির্জ্ঞান উপাদানের কাছে থেকে শক্তি পেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে।^{২৪}

সুজলার রূপ যৌবন সুবিমলবাবুর যৌনতার স্বপ্নকে প্ররোচিত করে। কিন্তু এই যৌন আবেদনগুলিকে সুবিমলবাবু সংস্কারের গণ্ডিতে বদ্ধ করে রেখেছেন। তাই এই অবদমিত চাহিদাগুলি সুজলার যৌবনের দোলায় সমস্ত রকম শৃঙ্খল লঙ্ঘন করতে চায়। শুধু তাই নয়, সুবিমলবাবুর মনে জন্ম নেওয়া স্বপ্ন এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবার মালতির উন্মুক্ত যৌবন দেখে সুবিমলবাবু অবদমিত সেই আবেগগুলিকে আর ধরে রাখতে পারেনি। ফলস্বরূপ সুবিমল বাবু জোরপূর্বক মালতির সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হন।

এই গল্পের মধ্যে আমরা সম্পর্কের যে চিত্র পাই তা বাস্তব সংসারের তৃতীয় পক্ষের মতো নয়। কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য করলে কিছুটা তৃতীয় পক্ষের মতই মনে হয়। এই সম্পর্কের সমীকরণ মনের অন্দরেই নির্মিত হয়েছে। এখানে প্রথাসিদ্ধ ত্রিকোণ সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও মনের মধ্যে ত্রিকোণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সেজন্য সুবিমলবাবু সুজলার রূপ-যৌবনকে সামনে রেখে, অর্থাৎ সুজলার শরীরের সঙ্গে মালতির শরীরের তুল্য মূল্য বিচার করেই মালতির সঙ্গে রতিক্রিয়ায় সম্মিলিত হয়েছেন। মনস্তত্ত্বের হাত ধরে আমরা বলতে পারি যে, যৌনপ্রবৃত্তিকে শত চেষ্টা করে অবদমিত করে রাখার চেষ্টা করলেও, তা যথার্থ যৌন প্রেষণার কাছে হার মানে। সেই কারণে সুবিমলবাবু, সুজলার যৌবনবতী শরীর এবং মালতির মধ্যে একটি ত্রিকোণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক গুলি যৌন-প্রেষণাকে অবদমিত করে রাখার ফলে হঠাৎ করেই গড়ে ওঠে। এই ধরনের সম্পর্কের ফলে সমাজে অসমাজিক কার্যকলাপের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

আবার জাতপাতের দিক থেকে অন্য আরেকটি সম্পর্ক গড়ে উঠে। কৌলিন্য প্রথার নিগড়ে যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রেখেছিল। তিনি ব্রাহ্মণ রমণী ছাড়া বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যৌবনের তাড়না যখন সুপার ইগোকে অতিক্রম করে, তখন জাতপাতের কথা ভুলে রক্ত মাংসে গড়া যেকোনো জাতের রমণীর

শরীর সঙ্গমের আকাঙ্ক্ষা জিনিসে পরিণত হয়। অর্থাৎ বলতে পারি যৌবন-ক্ষুধা জাতপাতের মন্ত্রে দীক্ষিত নয়। যৌবনক্ষুধা মেটানোর জন্য রক্তে মাংসে গড়া নরনারীই যথেষ্ট।

রাইগোপাল ও তার স্ত্রী লক্ষ্মীবালার বাক-বিতণ্ডার মধ্য দিয়ে ‘ডেভেরি’ গল্পের সূচনা হয়। তারপর কাহিনীবৃত্তের ভেতরে প্রবেশ করি ততই দেখতে পাই রাইগোপাল ও লক্ষ্মীবালার দুর্বিসহ দাম্পত্য জীবনের কথা। রাইগোপালগ নৈতিক শিক্ষার অভাবে বাড়িতে স্ত্রী ও পুত্র থাকা সত্ত্বেও আঙুরলতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এই গল্পে তৃতীয় পক্ষ আসার কারণ টাকার গরজে নৈতিক অধঃপতন। তাই রাইগোপাল বাঁঝা আঙুরলতার যৌবন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। তার কাছে তার স্ত্রী লক্ষ্মীবালার যৌবন তুচ্ছ হয়ে যায়। রাইগোপালের মনের ভাব এটাই বলে যে—

কোনো পুরুষই স্ত্রীলোকের জন্য সৃষ্টি হয়নি বরং স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।^{২৫}

পাঁচ.

কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস তার গল্পবিশ্বজুড়ে স্থান দিয়েছেন সম্পর্কের বহুকৌণিকতার বিষয়টি। সম্পর্কের নানা মাত্রা গল্পগুলিকে সাহিত্যের অঙ্গনে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায় দাম্পত্য সম্পর্কের প্রাধান্য। সেই দাম্পত্য সম্পর্কগুলি তৃতীয় পক্ষের কারণে ক্ষতবিক্ষত। এই তৃতীয় পক্ষ আসার একমাত্র কারণ যৌন অভীক্ষা। হরিশংকর জলদাস তাঁর গল্পে যৌনতার প্রসঙ্গ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

জীবনের প্রধান চাহিদাও বলতে পারেন। যদিও আমরা খাদ্যকে আমাদের প্রধান চাহিদা হিসেবে বলেছি। মানুষ যখন খাদ্যের অভাবে বিপন্ন...মানুষের জীবনের প্রধান অরি হল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি। কামকে মানুষের প্রধান শত্রুও বলতে পারেন, আবার মানুষের থাকে তখন কাম দ্বারা তাড়িত হয়। শুধু মানুষ কেন, পিপড়া থেকে শুরু করে তিমি ও হাতি পর্যন্ত সবারই কিন্তু যৌনজীবন বলে একটা জীবন আছে। তাদের মধ্যে যৌনতা বলে একটা ব্যাপার আছে। কামে উদ্দীপিত হওয়ার একটা শিহরণ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে আছে। আর মানুষের মধ্যে তো আছেই। তো নারী-পুরুষের এই যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, সেটা একেবারে সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। এবং সেটা মানুষের জীবনের প্রধান একটি অনুষঙ্গ বটে। মানুষের জীবনের প্রধান অনুষঙ্গকে এড়িয়ে কোন সাহিত্য রচিত হয় না। ... ভিক্টোরিয়ান যুগে সাহিত্যিকরা আড়াল দিয়ে, রাখঢাক করে সাহিত্য রচনা করেছেন। নারী-পুরুষের যৌনজীবনকে তাঁরা, মানে সে সময়ের ইংলিশ সাহিত্যিকরা উপস্থাপন করতে চাননি। সেই সময়েও কিন্তু নানা রকমের লেখা লিখিত হয়েছে। আড়ালে ইঙ্গিতে তাঁরা কিন্তু যৌনজীবনের কথা বলেছেন। ... রবীন্দ্রনাথও যৌনজীবনের কথা বলেছেন, তবে সেটা পরিশীলিত ভাষার মধ্যে দিয়ে। মানবজীবনের যৌনতাকে, বাংলা সাহিত্যে একেবারে উন্মোচিত করে দিয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ফ্রয়েড তো মানব সভ্যতাকে একটা জোর ধাক্কাই দিয়েছেন তাঁর তত্ত্ব দিয়ে। খাদ্য ছাড়া যেমন মানুষের জীবন চলে না, তেমনি করে কাম ছাড়া মানুষের জীবন চলে না। কামহীন মানুষ পৃথিবীতে কম আছে। দেখা যায়, যে সাধু মঠে বসে বা মন্দিরে বসে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছে সেই সাধুও সামনে সমবেত কোন যৌবনবতী নারীর প্রতি বাঁকাচোখে তাকাচ্ছে। এ বিষয়টাকে যারা অস্বীকার করে তারা প্রচলিতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।^{২৬}

সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের যে অন্তর্নিহিত গোপন সম্পর্কের বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তার জীবন্তভাষ্য হিসেবে কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের এই সাক্ষাৎকারকে গ্রহণ করতেই পারি। তাই তাঁর সমাজের নারী-পুরুষের যৌনমিলনের প্রসঙ্গ গল্পে সুস্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সম্পর্কের বহুকৌণিকতার নিয়ন্ত্রক হিসাবে যৌনতা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাঁর গল্পগুলিতে। তাই হরিশংকর জলদাস গল্পগুলিতে যৌনতার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এনেছেন। এমনকি এই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসার কারণ জানাতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

আমি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি বা যাদের নিয়ে লিখি, যে সম্প্রদায় বা যে অপাঙক্তেয় মানুষদের নিয়ে লিখি, তাদের বিনোদনের প্রধান উপায় কিন্তু এই যৌন জীবন, যৌনতা। তারা মদ খেয়ে উল্লাস করে। কোথাও বেড়াতে গিয়ে টাকা খরচ করবার ক্ষমতা তাদের নেই। তাদের মনের মধ্যে যখন বিনোদন জাগে, তখন সে বিনোদনের পরিসমাপ্তি ঘটে কোনো নারীর সঙ্গে উপগত হয়ে। এ জন্য তাদের জীবন থেকে যৌনতাকে বিযুক্ত করা কখনো সম্ভব নয়। তারা খাদ্যের সঙ্গে যৌনতাকেও প্রধান অবলম্বন করে। এবং সে জন্য আমার কথাসাহিত্যে যৌনতাবিযুক্ত নয়।... আমার কথাসাহিত্যে যৌনতা একটা জায়গা নিয়ে আছে।^{২৭}

অর্থাৎ কথাসাহিত্যিক তাঁর দেখা বাস্তব সমাজের নর-নারীর চরিত্র নির্মাণ করেছেন। যে চরিত্রগুলি যৌনতার ঘাত-অভিঘাতে দিনপাত করে। এই প্রসঙ্গে হরিশংকর জলদাসের বাস্তব সমাজ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ গল্পের বিষয় সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন—

...নরনারীর মনের জটিল কুটিল নানা দ্বন্দ্বকে তিনি গল্পের বিষয় করেছেন। উঠে এসেছে দাম্পত্য সঙ্কটের কথা, নারী-পুরুষের জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংস্রতা, আদিম যৌনতা, পুরুষতান্ত্রিকতা, ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা, নারী স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়।^{২৮}

গল্পকার হরিশংকর জলদাসের গল্পের মধ্যে আমরা সম্পর্কের বহুকৌণিকতার বিষয়টিকে দেখবার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই গল্পকারের সমাজবীক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ব্রাত্য মানুষজনের টিনাপোড়নে গড়ে ওঠা বহুমাত্রিক সম্পর্কের কথা। তাঁর গল্পে শুনতে পাই সম্পর্কে লিপ্ত রক্তমাংসের মানুষের জীবনকথা। সমালোচকের মতে—

হরিশংকর জলদাসের গল্পে নতুন কোনো নিরীক্ষার প্রচেষ্টা না-থাকলেও আছে গল্প, আছে রক্তমাংসের মানুষের উপস্থিতি, আছে সমাজ পরিমণ্ডলের আন্তরিক ছবি। কারণে অকারণে সমাজের চোখ রাঙানিকে দেখা যায় এই গল্পগুলোতে। দেখা যায় ভাঙাচোড়া মানুষগুলোকে।^{২৯}

ছয়.

‘সম্পর্ক’ শব্দটি সম্/পৃচ্ ধাতু থেকে আগত। ‘পৃচ্’ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। অর্থাৎ সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি তা হল পারস্পারিক মেলবন্ধনের সামাজিক ভিত্তি। এই সম্পর্ক বিভিন্ন কারণে বহুকৌণিকতায় ক্ষত বিক্ষত হয়। এই বহুকৌণিক সম্পর্কগুলি কীভাবে সুস্থির মনুষ্যসমাজকে কালসমুদ্রে নিমজ্জিত করে তার সাহিত্যিক দলিল হিসাবে আমরা হরিশংকর জলদাসের গল্পগুলির নাম করতেই পারি।

হরিশংকর জলদাসের গল্পগুলির মধ্যে আমরা বহুকৌণিক সম্পর্কের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই বহুমাত্রিক দাম্পত্য সম্পর্কের অস্থির চিত্ররূপ। এই দাম্পত্য সম্পর্কগুলির মধ্যে তৃতীয় পক্ষের আগমন হলেই দাম্পত্য সম্পর্কটি বহুকৌণিকতার কবলে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত হয়। তৃতীয় পক্ষ আগমনের কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি দেখতে পাই সেগুলি হল—

প্রথমত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দীর্ঘকালীন দূরত্ব।

দ্বিতীয়ত, সুন্দরের প্রতি মানবমনের চিরকালীন আকর্ষণ স্পৃহা।

তৃতীয়ত, অর্থের গরজে নৈতিক অধঃপতন।

চতুর্থত, সঙ্গমের অক্ষমতা।

পঞ্চমত, দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যকার সন্দেহ প্রবণতা।

ষষ্ঠত, পারস্পারিক অপছন্দ।

সপ্তমত, দাম্পত্য সম্পর্কে উপেক্ষার উপস্থিতি।

অষ্টমত, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ক্ষমতার বৈষম্যতা।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দূরত্বের কারণে আগত তৃতীয় পক্ষের কথা আমরা 'লুচা' ও 'কোটনা' গল্পে দেখতে পাই। দীর্ঘকালীন দূরত্বের কারণে মানব মনের অবদমিত যৌনতৃষ্ণা সামনে থাকা যেকোনো সম্পর্কের যে কোনো ব্যক্তির দ্বারা পরিতৃপ্তি পায়। 'লুচা' গল্পে দেখতে পাই মায়ের সমান বৌদির সঙ্গে দেবর স্বপনের অবৈধ সম্পর্কের কথা। যার ফলস্বরূপ সুধাম ও স্বপনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব চিরশত্রুতে পরিণত হয়। এমনকি সুধাম সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ থেকে পাগলে পরিণত হয়ে যায়। অন্যদিকে 'কোটনা' গল্পে ক্ষীরমোহন মায়ের ও কাকার অবৈধ সঙ্গমের দৃশ্য দেখে শিক্ষাজীবন থেকে নিজে সেরিয়ে নিয়ে বেশ্যাদের দালালে পরিণত করেছে।

মানব মন সৌন্দর্যের পূজারি। অনেক সময় সৌন্দর্যের পূজা করতে গিয়ে অনাবশ্যকভাবে দাম্পত্যে হাজির হয় তৃতীয় পক্ষের সম্ভাবনা। 'কোটনা' গল্পে গোরাচাঁদের সুন্দর দেহের প্রতি অঞ্জনার আসক্তি, 'ডেভেরি' গল্পে আঙুরলতার বাঁঝা যৌবনের প্রতি রাইগোপালের লোলুপতা, আবার 'ভাঙন' গল্পে অরুন্ধতীর মুখ পুড়ে যাওয়ার পর আপাত সুন্দরী শকুন্তলার প্রতি কুলদীপের টান সৌন্দর্যের পূজা ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলে 'ডেভেরি' গল্পে রাইগোপাল ও লক্ষীবালার সুখের সংসার কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তার ছবি। আবার 'ভাঙন' গল্পে কুলদীপের উপেক্ষার কারণে অরুন্ধতী বহুগামিতার পথে অভিযাত্রী হতে বাধ্য হয়। এই গল্পে আরো দেখা যায় অরুন্ধতী যে রামলালের কাছে যৌবন ক্রীড়ায় ধরা দিয়েছে, সেই রামলাল তার স্ত্রীর স্মৃতি নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত চরিত্রের সাধুত্বকে রক্ষা করতে পারেননি। অরুন্ধতীর রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে তার অবদমিত যৌনতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি ঘটায়।

দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তাদের মধ্যে কোনো একজনের সঙ্গমের ক্ষমতা না থাকলেও সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষ আসতে পারে। 'প্রতীক্ষা' গল্পে দেখতে পাই সুদর্শন নপুংসক। অপরদিকে নমিতা ভরা যৌবনবতী। নমিতা স্বামী সুদর্শনের মিলনের অক্ষমতা জেনে উন্মাদিনীতে পরিণত হয়। তখন তার যৌনতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য যেকোনো চেহারার, যেকোনো বয়সের, যেকোনো সম্পর্কের পুরুষত্বযুক্ত পুরুষ প্রয়োজন। সেই কামনার পুরুষটি নিজের বৃদ্ধ শশুর হলেও তার কোন আপত্তি নেই। এই গল্পে সৃষ্ট সম্পর্কের বহুকৌণিকতা সমাজ সংস্কারের ভিত্তিমূলে সপাতে চড় মারে। ফলস্বরূপ সুদর্শন ও নমিতার সদ্য বিবাহিত দাম্পত্য জীবন তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে।

'কীরকমভাবে বেঁচে আছি' গল্পে দেখা যায় সন্দেহ প্রবণতা সুস্থ সম্পর্কে এনে দেয় অস্থিরতার ঝড়। ফলস্বরূপ গল্পকথক দাম্পত্য সম্পর্কের মোহ কাটিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি দিয়েছেন। অন্যদিকে 'কোনো এক চন্দ্রাবতী' গল্পে দেখতে পাই খ্যাতনামা চন্দ্রাবতী অখ্যাত প্রফুল্লের কাছে থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এক নতুন সম্পর্কের পথ রচিত হয়। এই গল্পেই নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান হলে সম্পর্কের মাঝে কিভাবে ফাটল ধরে তার চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার। 'সুবিমলবাবু' গল্পে সুবিমলবাবু রক্ষণশীল সমাজ ভাবনা ও গোঁড়ামির দ্বারা যৌন তাড়নাকে পোষ মানাতে পারলেন না। শেষমেশ সুজলা ও মালতির রূপ যৌবনের কাছে হার মানতে হল। অনুমানের বলে বলতে পারি, সুবিমলবাবুর জোরপূর্বক রতিক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার ফলে হয়তো মালতির সুখের সংসার ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।

সমগ্র আলোচনা থেকে বলা যায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস সমাজ সংসারের মধ্যে থেকেই সম্পর্কের রাজনীতিগুলিকে সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে সম্পর্কের বহুকৌণিকতার প্রসঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের আগমনের কথা উঠে এসেছে বারবার। শুধু তাই নয়, ষড়রিপুর বন্ধন থেকে যে কোনো মানবমন মুক্ত নয়, তারও বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন গল্পকার। এমনকি তাঁর গল্পের কাহিনীর পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ। তাই তাঁর গল্পের কাহিনীতে যৌন প্রেষণার প্রসঙ্গ থাকাটা অতি স্বাভাবিক বিষয়। পাশাপাশি দেখতে পাই তাঁর গল্পে ফুটে উঠেছে ব্রাত্যজনের জীবন সংগ্রামের মর্মন্তুদ কাহিনি। এমনকি তাঁর গল্পের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখতে পাই নারী হৃদয়ের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টিকে। এছাড়া তাঁর গল্পে কাহিনি হয়ে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং সেই রাষ্ট্রিক অস্থিরতায় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারদের অত্যাচারের প্রসঙ্গ। জীবন অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বাস্তব প্রজ্ঞা শক্তির গুণে সমাজের অভ্যন্তরীণ নিষ্পেষিত, পদদলিত, নির্যাতিত ব্রাত্যজনের জীবনকথার পাশাপাশি অবদমিত নারী মনের হৃদয়বৃত্তির জটিল তত্ত্বগুলিকে তাঁর গল্পে উপস্থাপন করেছেন। তাই বলতে পারি, তাঁর গল্পগুলি কেবলমাত্র সাহিত্যের সন্টারকে

পরিপুষ্ট করে এমনটা নয়, তা সমানভাবে বাংলাদেশের বাস্তব সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের গতিবিধির নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. জলদাস, হরিশংকর, গল্পসমগ্র -১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬
২. bn.m.wikipedia.org
৩. মুহাম্মদ, মহি, হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৭ [উৎস : মহর্ষি সরকার, 'হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব', শান্তনু সরকার (সম্পা.), শুভশ্রী পত্রিকা, 'বাংলাদেশের গল্প বাংলাদেশের গল্পকার সংখ্যা', ৫৬বর্ষ, ২০১৭-২০১৮, পৃষ্ঠা. ২৭৩-২৭৪]
৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৭৪
৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৭৪
৬. জলদাস, হরিশংকর, গল্পসমগ্র -১, পূর্বোক্ত
৭. জলদাস, হরিশংকর, 'কোটনা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬
৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৬
৯. মিশ্র, ড. পুষ্পা ও ড.মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা. ৪৮-৪৯
১০. জলদাস, হরিশংকর, 'লুচ্চা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৩
১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৪
১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১২৬
১৩. জলদাস, হরিশংকর, 'প্রতীক্ষা', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৪
১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৪
১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪৪
১৬. মিশ্র, ড. পুষ্পা ও ড.মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৪
১৭. জলদাস, হরিশংকর, 'ভাঙন', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৯-১৫০
১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৩
১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৫৩
২০. মিশ্র, ড. পুষ্পা ও ড.মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৮-৪৯
২১. মন্ডল, জগদীন্দ্র, ফ্রয়েড: স্বপ্ন ও প্রাসঙ্গিকচর্চা, পুষ্পা মিশ্র (সম্পা.), সিগমুন্ড ফ্রয়েড, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪২১, পৃষ্ঠা. ১৯৪
২২. জলদাস, হরিশংকর, 'কীরকমভাবে বেঁচে আছি', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৩১৮-৩১৯
২৩. জলদাস, হরিশংকর, 'কোনো এক চন্দ্রাবতী', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৮৩-২৮৪
২৪. ফ্রয়েড, সিগমুন্ড, মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা (বঙ্গানুবাদ) পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্র মিত্র (সম্পাদিত), নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭, পৃষ্ঠা. ৮৮

২৫. রাসেল, বার্ট্রাউ, ক্ষমতায় ইতিবৃত্ত (ভাষান্তর— শেখ মাসুদ কালাম ও কাজী রোহানা মাসুদ), নান্দনিক, ঢাকা প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১২, পৃষ্ঠা. ১৭৯

২৬. মুহাম্মদ, মহি, হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৯-৯০ [উৎস : মহর্ষি সরকার, 'হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব', শান্তনু সরকার (সম্পা.), শুভশ্রী পত্রিকা, 'বাংলাদেশের গল্প বাংলাদেশের গল্পকার সংখ্যা', ৫৬ বর্ষ, ২০১৭-২০১৮, পৃষ্ঠা. ২৯৬-২৯৭]

২৭. ঐ, [উৎস : পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯৭]

২৮. সরকার, মহর্ষি, 'হরিশংকর জলদাসের গল্পবিশ্ব', শান্তনু সরকার (সম্পা.), শুভশ্রী পত্রিকা, 'বাংলাদেশের গল্প বাংলাদেশের গল্পকার সংখ্যা', ৫৬ বর্ষ, ২০১৭-২০১৮, পৃষ্ঠা. ২৯৯

২৯. মুহাম্মদ, মহি, 'হরিশংকর জলদাস : কথাসাহিত্যে অন্য স্বর', চন্দন আনোয়ার (সম্পা.), এই সময়ের কথাসাহিত্য, অনুপ্রাণন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর- ২০১৪, পৃষ্ঠা. ১৩৯

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আনোয়ার, চন্দন (সম্পা.), এই সময়ের কথাসাহিত্য, অনুপ্রাণন প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০১৪

২. জলদাস, হরিশংকর, গল্পসমগ্র -১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩. মিশ্র, ড. পুষ্পা ও ড.মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সিগমুন্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী (প্রা.) লিমিটেড, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৭,

৪. রাসেল, বার্ট্রাউ, ক্ষমতায় ইতিবৃত্ত (ভাষান্তর— শেখ মাসুদ কালাম ও কাজী রোহানা মাসুদ), নান্দনিক, ঢাকা প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০১২,

পত্র-পত্রিকাপঞ্জি :

১. মিশ্র, পুষ্পা (সম্পা.), 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৪২১

২. সরকার, শান্তনু (সম্পা.), শুভশ্রী পত্রিকা, 'বাংলাদেশের গল্প বাংলাদেশের গল্পকার সংখ্যা', ৫৬ - বর্ষ, ২০১৭-২০১৮